'স্ত্রীশিক্ষা' : রবীন্দ্র সমকাল ও রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গি

খায়রুন নিসা*

[সারসংক্ষেপ : উনিশ-শতকে বাংলায় নবজাগরণকালে নারীর মহিমা শিক্ষিত বাঙালিকে মোহিত করলেও নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষা সম্পর্কে তাদের মতানৈক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই দ্বিধা থেকে মুক্ত ছিলেন না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড বাঙালি নারীজীবনে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিল রবীন্দ্র নারীচেতনা ছিল তারই অভিঘাতের ফল। নারী-স্বাধীনতা ও নারী-শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট, আধুনিক ও অগ্রসৃয়মান দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়; যদিও পরিণত বয়সে তাঁর নারীচেতনা ভারতীয় ঐতিহ্যপুষ্ট, সাহিত্যিক ভাবনামণ্ডিত, কবিত্বপূর্ণ ও রোমান্টিক। স্বীয় সাহিত্যকর্মে নারী শিক্ষার প্রতি তাঁর রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মনোভাবের স্ববিরোধ পরিলক্ষিত হলেও 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি নিজ মতকে স্পষ্ট করেছেন। সেখানে তিনি সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করেছেন। আলোচ্যমান প্রবন্ধটিতে নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের দ্বৈত ও দ্বৈধ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ই কেবল পাওয়া যায় না বরং, তিনি নারীকে সভ্যতা বিকাশের প্রধান সোপান হিসেবে দেখে নারীর শিক্ষা ও ভব্যতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিতে নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা বিষয়ে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের একটি প্রয়াস রয়েছে।]

এক

শিল্প সাহিত্যের জগৎ ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ভারতবর্ষের মানুষের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের জন্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধরনের কাজ পরিচালনার সময় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেন শিক্ষা বিস্তারের উপর, যার প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর শিক্ষাচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে। সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছাতে যে সংকটগুলো উপস্থিত হয়েছিল তার কারণ বিশ্লেষণ করে উত্তরণের পথনির্দেশ করেছেন একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীর জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত কি না—এই বিষয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছিল। এই বিতর্কে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারসহ আরও অনেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমর্থন জানিয়ে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন। রামমোহন রায় তাঁর বিভিন্ন লেখায় নারীদের শোচনীয় অবস্থার কথা তুলে ধরেন। নারীরা যে কখনো কখনো পণ্যের চেয়েও বেশি সস্তা এবং অবমূল্যায়িত সেই বিষয়টি সমাজে উপস্থাপন করেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁর সময়কালে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতীয় নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারলে আজীবন তাদের দাসত্ব করে যেতে হবে। তাই বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং কখনো কখনো সরকারি সহায়তায় মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাঁদের সমসাময়িক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

স্ত্রীশিক্ষাকে সাদরে সম্ভাষণ জানাতে পারেননি। এমনকি উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকেও শিক্ষিত এবং উচ্চবিত্ত মহলের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন জানাতে পারেননি। অন্যদিকে স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন জানালেও স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে শিক্ষিত সমাজ দ্বিধান্বিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো নবজাগরণের অনির্বচনীয় স্তম্ভ বাঙালির বৈষয়িক ও আত্মিক জীবনে অভাবনীয় গুরুত্ব রাখলেও তাঁর দীর্ঘ জীবনের বেশ কাল ধরে এই দ্বিধা থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাই রবীন্দ্র চিন্তায় বারবার ফিরে এসেছে সে দ্বৈত ও দ্বৈধ দৃষ্টিভঙ্গির কথা। তবুও নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়েছে। সেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা রবীন্দ্র সাহিত্যে পাই। রোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ নারীকে কল্পনা করেছেন অন্তরের মানস-সুন্দরীর মতো। তাই রবীন্দ্র নারীচেতনা ভারতীয় ঐতিহ্যপুষ্ট এবং সাহিত্যিক ভাবমণ্ডিত। মূলত রামমোহন-বিদাসাগর-শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড বাঙালি নারী জীবনে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিল রবীন্দ্র নারীচেতনা তারই অভিঘাতের ফল। নারীস্বাধীনতা এবং নারীভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়েছে। এর পরও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এবং সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি মনে হয় রয়েই গিয়েছিল। অনেক পাঠকের কাছে তাঁর উপন্যাস-গল্পে নারীর প্রতি রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মনোভাবের স্ব-বিরোধটি ধরা পড়ে। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামতকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে একজন সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ-সংস্কারক হিসেবে। স্ত্রীশিক্ষার যে অপরিসীম গুরুত্ব সেটি স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। নারীকে মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন সে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এরপরও নারীস্বাধীনতা এবং নারীশিক্ষার বিষয়ে কখনও কখনও তাঁর দ্বিমুখী আচরণ লক্ষ করা গিয়েছিল। এবং সেখান থেকে তিনি তাঁর পরিণত বয়সে ঘুরে দাঁড়ান ইতিবাচকভাবে। এজন্য রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় নারীশিক্ষার বিষয়টি আসে অবধারিতভাবেই। এখানে একটি কথা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য, রবীন্দ্র নারীভাবনার মতো রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনাও তাঁর কবিমন এবং জীবনদর্শন প্রসূত।

দুই

উনিশ শতকের প্রথমদিকে যখন নারীশিক্ষার বিষয়টি শিক্ষিত সভ্য মহলে সবার সামনে আসে তখন সবার মনে নারীশিক্ষার আসলেই প্রয়োজন আছে কি না সেটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নারীশিক্ষার বিষয়টি ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির কাছেও কিছুটা অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকর ঠেকে। নব্যশিক্ষিত ভারতীয় বাঙালির কাছেই যদি বিষয়টি এমন দ্বিধার বিষয় হয় তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা আরোও প্রশ্নবোধক চিহ্নের উদ্রেককারী নিশ্চয়। এই অবস্থায় নারীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলে যদি সে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে যায়, কন্যা সন্তানকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসলে যদি সমাজচ্যুত হতে হয়, যদি বংশ-মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে—এরকম হাজারো প্রশ্নের সূচনার ফলে সংশয়ের ঘোরে পড়েন শিক্ষিত বাঙালি। মেয়েদের মাথায়ও যে চিন্তাশক্তির ক্ষমতা আছে সেটি মেনে নিতে অনেক সময় গড়িয়ে যায়। ফলে রক্ষণশীল সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উনিশ শতকের প্রায় দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত নারীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোন ধরনের সুযোগ পাননি। খ্রিস্টান মিশনারীদের মাধ্যমেই ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার সূচনা হয়। ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে মূলত মিশনারিরা বেশ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। এদের মধ্যে নারী শিক্ষা একটি। রবার্ট মে নামে একজন মিশনারি সর্বপ্রথম ১৮১৮ সালে চুঁচুড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মারা যাবার পর মিশনারিরা 'ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' তৈরি করেন যা পরবর্তীতে 'ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি'

নামে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর ১৮২১ সালে মিস মেরি আন কুক প্রথমে স্কুল সোসাইটির অসহযোগিতা পেলেও 'চার্চ মিশনারি সোসাইটি'র সহযোগিতায় বেশ কিছু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেগুলোতে প্রায় ২৭৭ জন ছাত্রী পড়াশুনার সুযোগ পায়। তার বালিকা বিদ্যালয়গুলো বেশ জনপ্রিয়তা পায়। মিস কুক ১৮২১ থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত নারী শিক্ষার প্রসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। যেহেতু খ্রিষ্টান মিশনারিদের শিক্ষা প্রসারের ভেতরের কারণটি ছিল ধর্মপ্রচার করা তাই তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে অনেক ধর্মীয় বিষয় কৌশলে শেখাতে থাকেন তারা। এই সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হবার পর হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল থেকে শুরু করে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুরাও সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগলেন। আগে থেকেই যেখানে সমাজচ্যুত হবার ভয় তাদের মধ্যে ছিল সেখানে ধর্মনাশের বিষয়টিও যোগ হয়। ফলে স্পষ্টতই মিশনারিদের স্কুলগুলো জনপ্রিয়তা হারায় এবং তাদের নারীশিক্ষা কার্যক্রম ব্যর্থই হয়। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেন :

> বেঙ্গল লেডিস সোসাইটি বহুবৎসর জীবিত থাকিয়া কার্য করিয়াছিল। এমনকি ১৮৩৪ সালে আডম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুরশিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকা বিদ্যালয় ও প্রায় ৪৫০টি বালিকার উল্লেখ দেখা যায়; এবং ওইসকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি লেডিস সোসাইটির সভ্য মহোদয়গণের উৎসাহে স্থাপিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু এই সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের স্থাপিত ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার কার্য্যের অঙ্গীভূত ছিল। (শিবনাথ, ২০১৭ : ১৬০)

ধর্মনাশের ভয়ে অনেক শিক্ষিত অভিজাত হিন্দু নিজেদের কন্যাকে মিশনারি স্কুল থেকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। তারপরও কিছু প্রগতিশীল হিন্দু সভ্য স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ধর্ম এবং সামাজিক মর্যাদা দুটোই যেন ঠিক থাকে—এই চিন্তা মাথায় রেখে বাড়িতে শিক্ষক নিয়োগ করে অনেক অভিজাত পরিবার তাদের স্ত্রী-কন্যাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই সুযোগটা সার্বজনীন হয়নি, কারণ কেবল অভিজাত এবং উচ্চবিত্তরাই তাদের স্ত্রী-কন্যাদের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে এই ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবে উনিশ-শতকের নারীরা হিন্দু রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইংরেজদের ধর্মীয় রাজনীতির কারণে উনিশ-শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত সহজভাবে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি।

ভারতবর্ষে প্রকৃত অর্থে নারীশিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেন জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন। ১৮৪৮ সালের ৭মে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' নামে তিনি একটি স্কুল চালু করেন যেখানে সত্যিকার অর্থে নারীদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। তার উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ আরও অনেক দেশীয় সভ্য নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তাকে সাহায্য করেছেন। বিটনের 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' এর প্রথম দুজন ছাত্রী ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যাদ্বয় কুন্দমালা ও ভূবনমালা। এ প্রসঙ্গে চিত্রা দেব বলেছেন :

> দেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে স্কুলটি স্থাপন করেন ভারত হিতৈষী জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন। স্কুলটি প্রথমে খোলা হয়েছিল রাজা দক্ষিণারঞ্জনের সুখিয়া স্ট্রিটের বাড়ির বৈঠকখানায়। [...] এই স্কুলের প্রথম দুটি ছাত্রী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই মেয়ে কুন্দমালা ও ভুবনমালা। মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্যে তাঁকে নিজের গ্রামে সমাজচ্যুত হতে হয়। ওই দুজনের সঙ্গে আরও উনিশটি মেয়ে স্কুলে ভর্তি হন। (চিত্রা, ২০২১ : ১২-১৩)

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন তার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি এই স্কুলকে দান করেছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সরকার এই স্কুলের নাম তাঁর নামে নামাঙ্কিত করেন। 'হিন্দু ফিমেল কলেজ' যথার্থ অর্থেই নারী শিক্ষার জোয়ার এনেছিল। ঠাকুর বাড়ির মতো অভিজাত বাড়ির কন্যারাও বেথুন প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ফিমেল স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। তৎকালীন কলকাতার বহু নারীদের রোল মডেল ছিলেন ঠাকুরবাড়ির নারীরা। ফলে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের দেখা দেখি কলকাতার অনেক সভ্য এবং অভিজাত ঘরের মেয়েরাও এই স্কুলে ভর্তি হন। ঘর থেকে বের হয়ে মেয়েদের পড়াশুনা করার বিষয়টি অনেকেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেননি। মদনমোহন তর্কালঙ্কার যেমন সমাজচ্যুত হয়েছিলেন তেমনি আরও অনেক মেয়েদের অভিভাবকও নানারকম হুমকি এবং কটুক্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন। যে সব পত্র-পত্রিকা নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলত তারাও নারীস্বাধীনতা এবং নারীশিক্ষা নিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। উনিশ শতকের বিখ্যাত কবি ঈশ্বরগুপ্তের *সংবাদ প্রভাকর*-এ নারীশিক্ষার পক্ষে কথা বলেছিলেন অনেকেই। নারীরা যখন সত্যিকার অর্থে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল মুক্তির আলোতে, সেটিকে কিন্তু ইতিবাচকভাবে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি ঈশ্বরগুপ্তও বেথুন কলেজের মেয়েদের ব্যঙ্গ করে 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় লিখেছেন :

আগে মেয়েগুলো, ছিলো ভালো,
ব্রত-ধর্ম্ম কর্ত্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ বি" লিখে বিবি সেজে,
বিলেতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে
সাঁজ-সেজোতির ব্রত গাবে।
সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আরকি খাবে।
ও ভাই! আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে
পাবেই পাবে দেখতে পাবে
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ॥ (হাই ও পাশা, ২০১২ : ১৮০)

এই কবিতার মর্মার্থ যদি উদ্ধার করি তাহলে এটি স্পষ্ট হয় যে ঈশ্বরগুপ্ত নারীস্বাধীনতার বিষয়টিকে ইতিবাচক ভাবে নিতে পারেননি। অন্য অভিজাত এবং সাধারণ হিন্দু সভ্যদের মতো তিনিও নিশ্চিত ছিলেন যে, নারীরা ঘরের বাহিরে বের হয়ে আসলে ধর্ম-কর্ম থেকে তারা বিচ্যুত হবে। সংসার ধর্মেও তারা অমনোযোগী হয়ে যাবে। সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে তারা আর আগের মতো পরোয়া করবে না। এভাবে নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে বেথুন স্কুল থেকে 'বেথুন কলেজে' পরিণত হয়। এর ফলে উনিশ-শতকের নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার আরও অনেকখানি উন্মোচিত হয়। বেথুন কলেজের অনেক ছাত্রীই তাদের কর্মের মাধ্যমে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী নারীদের মধ্যে প্রথম স্নাতক পাশ করেন এবং প্রথম দক্ষিণ

এশীয় মহিলা ডাক্তার ছিলেন। চন্দ্রমুখী বসু দক্ষিণ এশীয় নারী হিসেবে প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন এবং কামিনী রায় মহিলা কবি ও সমাজসেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

উনিশ-শতকে নারীশিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সমাজসংস্কারের কাজে আজীবন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। নারীশিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকার কারণে সরকারি সহযোগিতা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকগুলো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন লেখায় ইতিবাচক দিকগুলো নির্দেশ করে সাধারণ মানুষকে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তিনি আগ্রহী করেছিলেন। শুধু তাই নয় বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য যুক্তিসহ কারণ উপস্থাপন করেছেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুদিন পর্যন্ত বেথুন কলেজে কর্মরত ছিলেন।

এছাড়াও নারীশিক্ষার প্রসারে অনেক অভিজাত এবং শিক্ষিত বাঙালি এগিয়ে এসেছেন নিজ নিজ অবস্থান থেকে। উনিশ শতকে নারীশিক্ষার প্রসারে কিছু সংবাদপত্রও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *বামাবোধিনী*, *সোমপ্রকাশ*, *সমাচার দর্পন*, *সম্বাদ কৌমুদী* প্রভৃতি পত্রিকা নারীদের বিভিন্ন লেখা নিয়মিত ছাপাত। এই পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে উনিশ-শতকের বেশ কজন নারী সাহিত্যিকের দেখা পাই। সেই তালিকাও নেহায়েৎ ছোট নয়। তাঁদের অনেক লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। রাসসুন্দরী দাসী, সারদাসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, কৃষ্ণভবিনী দাসী, নিস্তারিনী দেবী, কামিনী রায়, সুদক্ষিণা সেন, বিবি তাহেরন নেসা, শরৎকুমারী দেব, ইন্দিরা দেবী, মানকুমারী বসু, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণকামিনী দাসী, প্রিয়ম্বদা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলাদেবী চৌধুরাণীসহ আরও অনেক নারী লেখকদের নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্র সমকালে উল্লেখযোগ্যভাবে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে বেড়ে ওঠেছেন অভিজাত একটি পরিবারে যেখানে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধনে আলাদা একটি জগৎ ছিল। যার ফলে উনিশ শতকের নারীজাগরণেও ঠাকুর বাড়ির বউ এবং মেয়েদের অনেকখানি অবদান ছিল। এ ক্ষেত্রে জ্ঞানদানন্দিনীর (১৮৫০-১৯৪১) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। মাত্র আট বছর বয়সে ঠাকুর পরিবারের মেজ ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তাঁর সমকালে ভারতবর্ষের নারীরা অবরোধ প্রথার মধ্যেই বাস করছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা জ্ঞানদানন্দিনীর জীবনকে আমূল পাল্টে দেয়। প্রগতিশীল চিন্তার ধারক সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে ভারতবর্ষের নারীদের রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। তিনি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে কেবল তাঁর উপযুক্ত বধূ হিসেবে তৈরি করার জন্য শিক্ষিত করে তুলতে চাননি, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আরও মহৎ। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ হিসেবে তাঁর স্ত্রী নিজেকে উপলব্ধি করতে শিখুক, সমস্ত ভারতীয় নারীদের জন্য শিক্ষা, সংস্কার ও আধুনিকতার মাইলফলক হয়ে উঠুক। এই পথটি মোটেও সহজসাধ্য ছিল না তার জন্য, কারণ তখন পর্যন্ত কঠিন অবরোধের মধ্যে ভারতের প্রায় প্রতিটি নারীকে জীবন যাপন করতে হতো। তিনি স্বামীর উৎসাহ এবং প্রণোদনায় পুরাতন নিয়ম ভেঙে নূতন পথের দিশা দেখালেন ভারতের নারীদের। অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে স্বামীর কর্মক্ষেত্রে গিয়ে থাকার সুযোগও পেয়েছিলেন তিনি। এর ফলে শাশুড়িসহ পরিবারের অনেক সদস্যের সঙ্গে মনোমালিন্যও সৃষ্টি হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন লন্ডনে অবস্থান করছিলেন তখন চিঠির মাধ্যমে ভাই হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে স্ত্রীর পড়াশুনার খোঁজ নিতেন। জ্ঞানদাকে ইংরেজি শেখানোর দায়িত্বও পড়েছিল হেমেন্দ্রনাথের ওপর। ১৮৭৭ সালের মে মাসে

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তিন ছেলে-মেয়েসহ বিলেত যাত্রা করেন। তাঁর পূর্বেও দুই-চারজন নারী বিলেতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তবুও জ্ঞানদার বিলেত গমন তার সকল অবরোধের অবসান ঘটিয়েছিল। মূলত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদারপন্থী চিন্তা-ভাবনার কারণে তা সম্ভবপর হয়েছিল। "মহর্ষি পরিবারে নারী জাতির উন্নতিকল্পে ক্রমশ যে সকল ব্যবস্থা স্বীকৃত হতে লাগল তার প্রবর্তনের মূলে তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন" (পুলিন, ২০১২ : ২০৪)। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপর দুই ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথও ঠাকুরবাড়ির নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতায় বেশ ভূমিকা রেখেছিলেন। মহর্ষি-কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্য-সাধনাকে ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরবাড়ির *ভারতী* পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর মৃত্যুর পর *ভারতী* সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তারই কন্যাদ্বয় সরলা দেবী এবং হিরন্ময়ী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী পড়াশুনা শেষ করে ছাব্বিশ বছর বয়সে এবং ভাগ্নি সরলা বিয়ে করেন তেত্রিশ বছর বয়সে। সরলা দেবী ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। সর্বোপরি এ সকল বিষয় অবলোকন করেই চিত্রা দেব মন্তব্য করেন :

> সুতরাং অসংখ্য বাধা নিষেধের গণ্ডি পার হয়েই মেয়েদের এমনকি ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছিল। সহজে হয়নি। প্রথম দিকে এ বাড়ির মেয়ে এবং বউয়েদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ শক্তির পরিচয় রেখে গিয়েছেন, কিন্তু যাঁদের নাম বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েনি, পড়বার কারণও নেই, তাঁদের ভূমিকাও নেহাত কম ছিল না। চলবার বাঁধা-পথ তাঁরা পাননি, পথ তাঁদের তৈরি করে নিতে হয়েছিল। (চিত্রা, ২০১৪ : ২)

সুতরাং বলা যায় যে, উনিশ শতকের নারী আন্দোলন সত্যেন্দ্রনাথের দান এবং এটি প্রধানত তাঁর পরিবারের মধ্য দিয়েই বিস্তার লাভ করেছে। অর্থাৎ "উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার প্রধান একটি কেন্দ্র দেবেন্দ্র ভবন, বঙ্গনারীর আত্মবিকাশের উদ্‌যোগ এই পরিবারের কন্যা ও বধূদের দ্বারা এককালে অনেকখানি পুষ্টি লাভ করেছে" (পুলিন, ২০১২ : ২০৪)। তবে একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যাসন্তানেরা ঠাকুরবাড়ির সন্তান হয়েও ইন্দিরা-সরলার মতো এগিয়ে যেতে পারেননি। আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিনটি মেয়েকেই বাল্যবিবাহ দিয়েছেন। বাল্যবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের ফলে যে সামাজিক অবক্ষয় তা নিয়ে তিনি লিখেছেনও বিস্তর, কিন্তু নিজ কন্যাদের ক্ষেত্রেই তা রক্ষা করতে পারেননি। তিনি যখন অর্থকষ্টে ছিলেন তখনও পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন কৃষি বিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য। সেই হিসেবে কন্যাদের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি। ফলে মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেবার বিষয়টিকে নিয়ে অনেকেই তাঁকে ঠাট্টা পরিহাস করেছেন। কারণ "শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্রাহ্ম-সমাজের সদস্য 'স্ত্রী-স্বাধীনতার দল' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তাঁরা বাল্য বিবাহের বিপক্ষে, স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে সংগঠিত হয়েছিলেন"। (সুদক্ষিণা, ২০১৫ : ৮)

এই বিষয়গুলো খেয়াল করলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি তাহলে স্ত্রী স্বাধীনতা বা স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টিকে ব্যক্তিগতভাবে তেমন আমলে নেননি? সত্যিকার অর্থে পরবর্তীতে এটি তাঁর সামনে প্রশ্ন হয়েই দাঁড়ায়। তাহলে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি রক্ষণশীল মনোভাবের ছিলেন? তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন মৃণাল, অনিলা, বিমলা, ইলা, বিনোদিনী, সোহিনীর মতো চরিত্র। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রীশিক্ষা বা স্ত্রীস্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন এই

মন্তব্যটিও তাঁর উপর আমরা চাপিয়ে দিতে পারি না। তাহলে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষয়টি তিনি কীভাবে, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন সেটি পর্যালোচনার চেষ্টা করবো।

তিন

একজন সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের মানুষের মানসিক দাসত্ব মোচন করতে হলে শিক্ষার বিস্তার এবং সংস্কার অত্যাবশ্যক। তখন ভারতবর্ষে শিক্ষিত সমাজের আনাগোনা ছিল না বিষয়টি মোটেও এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেন, ভারতবর্ষে যে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির উৎপত্তি হয়েছিল তাদের বেশিরভাগই ঔপনিবেশিক দাসত্বপ্রবণ মন-মানসিকতার। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ইংরেজ মিশনারিরা ভারতের শিক্ষাবিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেখানে তাদের বিশেষ লক্ষ ছিল খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়ানো। ফলে তাদের শিক্ষাবিস্তারের পেছনে একটা গূঢ় উদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল। মিশনারি স্কুলগুলোতে খ্রিষ্টান ধর্ম অনুসরণ করে অনেক নিয়ম নীতি পালন করা হতো। কিন্তু এসব মিশনারি স্কুল থেকে শিক্ষার সারবস্তু অনেক ছাত্রই উদ্ধার করতে পারত না। ফলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ছোটবেলাতেই আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে পাঠশালায় যাবার জন্য বালক রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের শেষ ছিল না। দাদা এবং ভাগ্নে সত্যেন্দ্রনাথের স্কুলে যাওয়া দেখে অনুযোগ করতেন তিনি। তখন তাঁর গৃহশিক্ষক তাঁকে চপেটাঘাত করেন। *জীবনস্মৃতিতে* লিখেছেন :

> যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, "এখন স্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।" সেই শিক্ষকের নামধাম আকৃতি প্রকৃতি আমার কিছুই মনে নেই, কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী জীবনে আর-কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২ : ১৪)

তার মানে শিশু রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শিক্ষাপ্রণালি আকৃষ্ট করতে পারেনি। সেখান থেকে তিনি কি শিখেছিলেন তা তাঁর মনে নেই কিন্তু সেখানে যে শক্ত শাসন প্রণালি ছিল সেটি তাঁর স্পষ্টত মনে আছে।

শিক্ষাচিন্তা বিষয়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' (১২৯৯)। এখানে ভারতবর্ষের গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। বালক রবীন্দ্রনাথকে কেন বিদ্যালয় আকৃষ্ট করতে পারেনি সেই বিষয়টি আমরা এখানে উপলব্ধি করতে পারব :

> স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিলাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না। (শোয়াইব, ২০১২ : ১৩)

'বিজাতীয় ভাষা'য় মুখস্থ শক্তির মাধ্যমে শিশুরা পড়াশুনা শুরু করে এবং না বুঝে শুধু কলের পুতুলের মতো ইংরেজি বলতে থাকে। এখানে না হয় ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ, না হয় নিজের মাতৃভাষার সঙ্গে। আরেকটি গুরুতর বিষয় হচ্ছে, যে সকল মাস্টারমশাইরা পড়ান তাদের নিজেদেরই ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্যের জ্ঞান একেবারেই সীমিত। তারা ভালো

ইংরেজিও জানেন না, ভালো বাংলাও জানেন না। এই অবস্থায় ছাত্রের কি করুণ দশা হতে পারে তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও বলেন যে, এই ইংরেজি ভাষাটা যেহেতু বিদেশিদের ভাষা, বিজাতিদের ভাষা; সেহেতু আমরা একে যথাযথভাবে আত্মস্থ করতে পারিনা। তাই পরীক্ষার খাতায় মুখস্থ লিখলেও, বক্তৃতায় ব্যবহার করলেও জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেটির কোনও প্রয়োগ আমরা করতে পারি না। এভাবেই ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার গোঁজামিল আর হেরফের তুলে ধরেছেন 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে। নিজের অপ্রাপ্তির জায়গা থেকেই হয়তো পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর মেধা, মনন এবং প্রজ্ঞায় শান্তিনিকেতনে এক অভিনব শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। বিলাসিতাহীন, অনাড়ম্বর এবং দারিদ্র্যকে অতিক্রম করে জ্ঞানের সাধনা-ই ছিল এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা যদি বালক রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করতেই পারত তাহলে শ্রীনিকেতন বা শান্তিনিকেতনের স্বপ্ন হয়তো তিনি দেখতেন না। এখানে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্য শিক্ষা বা জ্ঞানের বিরোধী কখনোই ছিলেন না, তিনি শুধু চেয়েছিলেন অর্জিত শিক্ষা যেন প্রায়োগিক হয়, জীবনে সেটির যথাযথ ব্যবহার যেন করা যায়, শিক্ষা যেন অকেজো কোনও বস্তু হয়ে পড়ে না থাকে। খুব অল্প বয়সেই শিক্ষাভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌলিকত্ব ধরা পড়ে। তিনি লিখেছেন :

> বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি মুখস্ত করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের রুচির উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮৯ : ৬১)

বঙ্গদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বাহন ইংরেজি হওয়ার কারণে মূলত এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ছাত্ররা। একে তো বিদেশি ভাষা, তার উপর আবার কঠিন শাসনতন্ত্র ছাত্রদের সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখত। ফলে অচিরেই মুক্তচিন্তার সুযোগ এবং কল্পনাশক্তি নষ্ট হয়ে যেত ছাত্রদের। তাই ভারতবর্ষে যদি যথাযথ বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন করতে হয় তবে মাতৃভাষা-ই যে হবে তার সবচেয়ে বড় বাহন সেই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে স্পষ্টত আমাদের ছাত্রদের ঝরে পড়ার কারণ নির্দেশ করে তা থেকে উত্তরণের পথ নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। 'বিলাতি বিদ্যা' যে কখনও আমাদের নিজেদের 'ভিতরের সামগ্রী' হয়ে ওঠে না; তা 'সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে'—এই সত্যটিকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চার প্রতি গুরুত্ব নির্দেশ করে এক্ষেত্রে জাপানের কথা উদাহরণ হিসেবে টেনেছেন :

> অথচ, জাপনি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি না। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না। সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, 'য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব।' যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে। (শোয়াইব, ২০১২ : ৭৪)

এজন্য দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি মিডিয়ামের পাশাপাশি বাংলায়ও যেন বিদ্যাশিক্ষার পথ খোলা রাখা হয় তার প্রতি যুক্তি প্রদান করেছেন।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা যে ঔপনিবেশিক ছাঁচে তৈরি এবং তার ক্ষতিকারক অনেকগুলো দিকও রয়েছে সেগুলো রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তায় ধরা পড়েছিল। ১৮৮০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের পেছনে অনেক বড় একট উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসকদের। তারা নামমাত্র শিক্ষিত কেরানি শ্রেণি তৈরি করার জন্য এবং ভারতবর্ষে তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীতে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'কেরানি' শ্রেণি দাসত্ব প্রবণ মন-মানসিকতা নিয়েই বেড়ে উঠেছিল যা এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান। নামমাত্র শিক্ষাগ্রহণ করে সার্টিফিকেটধারী হয়ে চাকরি পাওয়াই যাদের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। 'অসন্তোষের কারণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়টি স্পষ্টত তুলে ধরেছেন। বৃটিশ রাজশক্তি তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধার করার জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করেন তাতে তাদের প্রয়োজন যথাযথভাবেই মিটে যাচ্ছিল। কিন্তু সমস্যা তখনই হলো যখন ছাত্রের সংখ্যা বাড়ল কিন্তু কর্মসংস্থানের সংখ্যা তাল দিয়ে বাড়ল না। তাই ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কর্তৃক আরোপিত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তিনি মন্তব্য করেন :

> যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষে ব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকায় সংস্থানে পটু করিয়া তুলিত তাহা হলে এই সম্মন্ধে নালিশের কথা থাকিত না। কিন্তু পটু না করিয়া সর্বপ্রকারের অপটুই করিতেছে, এ কথা আমরা নিজের প্রতি তাকাইলে বুঝিতে পরি। (শোয়াইব, ২০১২ : ৮৭)

এই ব্যর্থতার কারণ ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা। বিষয়টি তখনই সমাধানের আলো দেখবে যখন আমরা বৃটিশদের দেয়া ছাঁচে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে আমাদের ভারতবর্ষের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারব। নইলে এই চাপিয়ে দেয়া শিক্ষাব্যবস্থার ফল *তোতা-কাহিনী'র* তোতা পাখির মতোই হবে।

ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং পশ্চাৎপদতা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা সংস্কারকের ভূমিকায় আসেন। তিনি শান্তিনিকেতনের জন্য এমন শিক্ষক খোঁজ করছিলেন যাঁরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। শান্তিনিকেতনে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন করে পাঠক্রম চলত। ঠাকুর পরিবারের ছেলে-মেয়েদের ওপরই সবচেয়ে বেশি এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছেন তিনি, এমনকি সফলও হয়েছেন। গ্রন্থগত বিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য কারিগরি শিক্ষাও তিনি প্রয়োগ করেছিলেন সবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই নিজের সকল কাজ করতেন। তিনি মুচি ও ছুতারের কাজও নিজে করেছেন। ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন ভাবিত তখন ভারতবর্ষের নারীশিক্ষার বিষয়টি আর কোনওভাবেই উপেক্ষিত থাকেনি। তবে নারী শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনা কিছুটা ভিন্ন ছিল। নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার বিষয়টিতে তিনি উদার ছিলেন এবং এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কবি ও দার্শনিক সুলভ। ফলে অন্যান্য তাত্ত্বিকদের সঙ্গে মতের সামঞ্জস্যতার পরিবর্তে ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাভাবনাই স্পষ্টত লক্ষণীয় হয়েছে।

চার

শ্রীমতি লীলা মিত্রের একটি পত্রের জবাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে যে প্রবন্ধটি রচনা করেন তাতে নারীশিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়টি সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। সমকালীন

আলোচনার প্রেক্ষিতে লীলামিত্র স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে এবং বিপক্ষে পুরুষদের অবস্থান উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত জানতে চেয়েছেন। লীলামিত্র এই চিঠিতে বেশ কয়েক শ্রেণির পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, একদল পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার ধারক স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টিকে তাদের জন্য হুমকি স্বরূপ বিবেচনা করেছেন। উনিশ শতকীয় চিন্তাভাবনার অন্যতম বিষয় ছিল পুরুষের আধিপত্য এবং নারী কর্তৃক সে আধিপত্যকে মেনে নেওয়া। এজন্য পুরুষরা কখনই চাইত না নারীরা শিক্ষিত হোক।

দ্বিতীয়ত, লীলামিত্র আরেক দল পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন যারা স্ত্রীদেরকে শুধু নিজেদের উপযুক্ত করে তোলার জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এখানে নারীমুক্তির জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন বা মানুষ হিসেবে যে নারীর বিকাশের প্রয়োজন রয়েছে তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন নিজেদের পারিবারিক সুখের ওপর।

মূলত এই দুই শ্রেণির পুরুষের চিন্তাভাবনার মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কেউই নারীকে ব্যক্তিমানুষ হিসাবে দেখছে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জায়গায় নিজের অবস্থানটি স্পষ্ট করেছেন। নারীকে মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে। আর যদি সে মানুষ হিসেবে পুরুষের সমান মর্যাদা পান তাহলে তো তার শিক্ষাটাও মৌলিক অধিকারের পর্যায়েই পড়ে। আমরা পূর্বেই উনিশ শতকের নারীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। সেই প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, তখনকার পুরুষরা নিজেদের জন্য শিক্ষিত স্ত্রীর কথা ভাবতেই পারতেন না। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি যখন আলোচিত তখন তাদের মনে এই বিষয়টি আসে যে, স্ত্রী-কন্যা শিক্ষিত হলে তাদের ধর্মনাশের আশঙ্কা থাকবে। স্ত্রীরা স্বামী-সন্তানের সেবা না করে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তাদের সংসারধর্ম সঠিকভাবে পালন হবে না। ঈশ্বরগুপ্তের 'দুর্ভিক্ষ' কবিতাটি এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। চারপাশে যখন নারীশিক্ষার জোয়ার আসছে তখন অনেক শিক্ষিত পুরুষ অনিরাপত্তায় ভুগেছে। সার্বজনীন শিক্ষার চিন্তা যেখানে করা হতো না সেখানে নারীশিক্ষার বিষয়টি আরও পরে আসে। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে মন্তব্য করেন—

> যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন একদল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোক প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে—বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিংবা নক্ষত্রলোকের নাড়িনক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড়ো বড়ো অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৬)

অর্থাৎ শিক্ষিতদের অনেক বড় একটা অংশই সাধারণ জনগণকে শিক্ষার বাইরে রাখতে চান। নারীকেও শিক্ষার বাইরে রাখার কারণও এখানে স্পষ্ট। তাদের মতে, মেয়েদের জন্ম পুরুষের সেবা করার জন্য, তাদের সন্তান ধারণ করার জন্য এবং ধর্ম-কর্ম করার জন্য। তাদের মতে, 'মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র'। এই কথাটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্বীকার করেন :

> বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন। এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই-যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম

> আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। স্কুল-মাস্টার কিংবা টেকসটবুক-কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিম্বা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্যপ্রবাহের মুখে বাধা দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল-মাস্টার এই দুয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেই জন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি-বা কান্ট-হেগেল্‌ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৬)

অর্থাৎ গঠনগত দিক থেকে মেয়েরা যে পুরুষ জাতি থেকে আলাদা সে বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানেন। কিন্তু কট্টরপন্থী অনেক নারীতাত্ত্বিক বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন—যেহেতু নারী এবং পুরুষ তারা একে অন্যের থেকে আলাদা, সেক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রও আলাদা হবে। তৎকালীন নারীতাত্ত্বিকরা নারীকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ সে দৃষ্টিতে নারীকে দেখেননি। তিনি নারীকে দেখেছেন স্ত্রী, কন্যা অথবা ভগিনী হিসেবে। যেহেতু নারীও মানুষ সেহেতু সেও শিক্ষারভাগ পাবে। এখানে নারীকে বঞ্চিত করা মানে ঈশ্বরকেও অবমাননা করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন—সন্তান জন্ম দেয়া, স্নেহ করা, কারও স্ত্রী হওয়া দাসীত্বের পর্যায়ে পড়ে না। এখানেই কট্টরপন্থী নারীতাত্ত্বিকদের সঙ্গে তাঁর চিন্তা-ভাবনার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন:

> আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৭)

রোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীকে দেখেছেন রোম্যান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর নারীরা স্বভাবকোমল এবং স্নেহপরায়ণ। ফলে নারীতাত্ত্বিকদের নারীচিন্তার সঙ্গে অবধারিতভাবেই তাঁর নারীচিন্তার একটা সংঘাত বাধে। মা হওয়া, স্ত্রী হওয়া নারীর জন্য কখনই অপমানজনক হতে পারে না; বরং তা নারীর জন্য সম্মানজনক।

বিপত্তি তখনই বাধে যখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর সম্মানের প্রশ্নটি আসে। সেই বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগোচরে থাকেনি। মেয়েদের স্বভাব কোমল আচরণকে বিশেষ করে ভারতবর্ষের পুরুষরা দুর্বলতা হিসেবে দেখে। মেয়েরা সংসার করবে, সন্তানের জননী হবে এই বিষয়টিকে তারা অনিবার্য মনে করেছে। মোটকথা, মেয়েরা পরিবারের কাছে দায়ে পড়েই আত্মসমর্পণ করছে। তাই তাদের প্রতি অবিচার করা স্বার্থপর পুরুষের কাছে কোনও বিষয়ই নয়। এই সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে দুঃখবোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নারীশিক্ষার বিষয়টি যখন আলোচনার তুঙ্গে তখন নারীস্বাধীনতার বিষয়টি এর সঙ্গে যুক্ত হয়। কারণ, যদি স্ত্রী-কন্যাদের শিক্ষিত করতে হয়, তবে তাদের উপর যে অবরোধ প্রথা চাপিয়ে দেয়া আছে সেটিকে আগে প্রত্যাহার করতে হবে। এজন্য নারীকে নিয়ে আরও ভাবতে হবে এবং এই ভাবনার সংকীর্ণ জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নিজেকে মুক্ত করেছেন। সমালোচকের মতে—

> নারীজীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার শেষতম পরিচয়স্থল 'স্ত্রীর পত্র' গল্প। তিনি এক সময় বিশ্বাস করতেন, নারী জীবনের চরম সার্থকতা মাতৃত্বে ('শকুন্তলা','কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'/*প্রাচীন সাহিত্য*)। বর্তমান শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এ বিশ্বাস বজায় ছিল। তারপর এলো দুই নারী তত্ত্ব। নারীর দুই রূপ—প্রেয়সী ও জননী—তিনি দেখতে চেয়েছেন। প্রথমটার উদাহরণ আনন্দময়ী (*গোরা*) বা রাসমণি (রাসমনির ছেলে)। দ্বিতীয়টার উদাহরণ *বলাকার* 'দুই

> নারী' কবিতা, উর্মিলা ও শর্মিলা (দুই বোন)। তারপর এলো নারীত্বের তত্ত্ব—যে তত্ত্বের ব্যক্তিরূপ মৃণাল (স্ত্রীর পত্র) অনিলা (পয়লা নম্বর), কুমুদিনী (যোগাযোগ), সোহিনী (ল্যাবরেটরি)। সমাজ, শাস্ত্র ও পুরুষের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এইসব নারী চরিত্রে দেখা যায়। (অরুণকুমার, ২০১১ : ৭৪)

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে 'স্ত্রীর পত্রের' রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য আমাদের চোখে সুস্পষ্ট। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালকে সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আধুনিক শিক্ষিত নারী হিসেবে। শুধু স্ত্রীর পত্রের মৃণাল নয়, এর আগেও অসংখ্য শিক্ষিত নারীচরিত্র তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে যোগ করেছেন। মৃণালের মাধ্যমে হয়তো এতদিনের না-বলা কথায় স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ কোনভাবেই মৃণালের উপস্থিতি মেনে নিতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন :

> সবুজপত্রে 'স্ত্রীর পত্র' গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও সমাজে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। নারায়ণ মাসিকপত্রে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল তীব্র প্রতিবাদ করেন। নরায়ণ-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্রের' প্যারোডি 'মৃণালের কথা'। (অরুণকুমার, ২০১১ : ৭৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থক এর চেয়ে বড় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। শুধু শিক্ষা বা স্বাধীনতা নয়, নারী যে কবিও হতে পারে সেটি তিনি মৃণালের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন :

> আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্যার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জাননি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যা কিছু তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেই খানে আমার মুক্তি; সেইখে আমি আমি। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৭ : ৪৯৯)

নারীর নিজস্ব পরিসর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এভাবেই সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে। একই সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন তিনি। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য শান্তিনিকেতনে ব্যক্তিগত উদ্যোগও নিয়েছেন তিনি। কিন্তু রোম্যান্টিক কবি এবং সাহিত্যিক হওয়ার কারণে অন্যান্য তাত্ত্বিক, লেখক বা সংস্কারকের সঙ্গে কিছুটা সংঘর্ষ কখনও কখনও ঘটেছে। তাই আমরা রবীন্দ্র নারীভাবনাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবো রবীন্দ্র জীবনদর্শন থেকে। এ সবকিছুর প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতা, নাটক, গান, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, ভাষণ এবং অবশ্যই তাঁর শিক্ষাচিন্তায়। রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার দার্শনিক ভিত্তি বুঝে নিলে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রচিন্তার ভুল ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন :

> ক. মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, একথা মানিতে দোষ কী? (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৬)
>
> খ. পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই অনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতে হইবে, দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা

প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৭)

গ. কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটা উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৮)

এসব বক্তব্য ও যুক্তিতর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা উপলব্ধি করি রবীন্দ্র জীবনদর্শনের গভীরতর দিক—যার প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক, গান, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, ভাষণ এবং অবশ্যই তাঁর শিক্ষাচিন্তায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের দুটি মূল বিষয় হলো মুক্তি ও আনন্দ। তাঁর সাহিত্যকর্ম থেকে এ-দুই বিষয়ে বিস্তৃত জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হতে স্বতন্ত্র' বলে 'তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র'। এই সত্যটিকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন না করলেই স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্র-দর্শন স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। নারীরা সন্তান-ধারণ ও প্রতিপালন করে। স্নেহ-প্রেম তাদের মজ্জাগত। সে-কারণেই "মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে" (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৮)। মেয়েদের আনুগত্য স্বভাবজাত, দুর্বলতা বা অক্ষমতা নয়। এই আনুগত্যকে জগৎ-সংসারের সকল মানুষ প্রাণভরে স্বীকার করে, যারা করে না তারা অকৃতজ্ঞ। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনায় মেয়েরা শিক্ষিত হলেও কখনও পুরুষের নিরাপত্তা কমে না, সন্তানের প্রতি তাদের স্নেহও বহাল থাকে। তাই যারা এই দোহাই দিয়ে স্ত্রীশিক্ষাকে অসমর্থন জানায় তারা আত্মপ্রবঞ্চকও বটে।

পাঁচ

ঊনিশ শতকের উপনিবেশিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামন্তবাদী পুরুষতান্ত্রিক শিক্ষা এবং সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের নারীচিন্তা ছিল চিরন্তন। তিনি নারীকে দেখেছেন মানবীরূপে, যে-নারীর মধ্যে মায়া, মমতা, মাতৃত্ব এবং সহনশীলতা থাকবে। নারীর এই ক্ষেত্রগুলো তো পুরুষ পরিপূর্ণ করতে পারে না। স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, বরং তিনি বলেছেন—"মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিংবা তাবে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানব প্রকৃতিকেই দুর্বল করি, একথা বলাই বাহুল্য" (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ : ২৮৬)। মন্তব্যটি নারী-পুরুষ উভয়কে উদ্দেশ্য করেই বলা। সেদিক থেকে জীবনের একটা সময়ে হয়তো রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেছেন কিন্তু পরিণত বয়সে এসে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গেই স্ত্রীশিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শুধু তাই নয় শিক্ষাপ্রণালিতে মেয়ে-পুরুষে বিভেদকে বিধাতাকে অমান্য করার সমতুল্য ভেবেছেন। বরং মেয়েদের 'মেয়ে হিসেবে' গড়ে তোলার জন্য 'বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা'র চেয়ে 'ব্যবহারিক শিক্ষা'র প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন; আর মানুষ হয়ে ওঠার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষার কথা বলেছেন। কেননা, যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে নারী-পুরুষের পার্থক্য নেই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকের দ্বিমত। কিন্তু রবীন্দ্র জীবনদর্শনের দিক থেকে তা যথার্থ হিসেবে আমরা মনে করি।

সহায়কপঞ্জি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১১)। *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

আনিসুজ্জামান (সম্পা., ২০১২)। *রবীন্দ্রনাথ : এই সময়ে*। আবুল মোমেন 'মানবের বিকাশ ও রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শ', প্রথমা, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (২০০০)। *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চিত্রা দেব (২০১৪)। *ঠাকুর বাড়ির আনন্দমহল*। আনন্দ মহল পাবলিশার্স, কলকাতা।

মনজুর আহমেদ (সম্পা., ২০১৫)। *সাপ্তাহিক আজকাল*। সুদক্ষিণা ঘোষ, 'রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা'। নিউ ইয়র্ক।

মুহাম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা., ২০১২)। *ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১৭)। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (খণ্ড-১৬)। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

(২০০৭)। *গল্পগুচ্ছ*। প্রতীক, ঢাকা।

(২০১২)। *জীবনস্মৃতি*। সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা।

শিবনাথ শাস্ত্রী (২০১৭)। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

শোয়াইব জিবরান (সম্পা., ২০১২)। *রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র*। সংবেদ, ঢাকা।

সুশান্ত সরকার (২০১১)। *রবীন্দ্রভাবনার পঞ্চ প্রান্তর*। শুদ্ধস্বর, ঢাকা।

হায়াৎ মামুদ (২০১১)। *রবীন্দ্রনাথ, অধরা মাধুরী*। শুদ্ধস্বর,ঢাকা।